চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক সমিতির উদ্ভব—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রারম্ভিক পর্ব

ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমশ বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির মাধ্যমে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের কাজে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এইসময় কয়েকজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা এইসকল সমিতি গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। মুম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরজী (১৮২৫-১৯১৭), বদরুদ্দীন তায়েবজী (১৮৪৪-১৯০৬), মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) এবং বাংলার আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমিতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে বিক্ষিপ্ত ও একক প্রতিবাদের স্থলে সমিতির মাধ্যমে যুক্তভাবে অগ্রসর হলে ভারতবাসীর মধ্যে জনমত জাগ্রত করা সম্ভব হবে। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক ডঃ অনিল শীল উনবিংশ শতাব্দীকে "সমিতির যুগ" (Age of Associations) বলে চিহ্নিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথমে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে জমিদার সমিতি গঠিত হয়, এরপর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে নব্যবঙ্গের নেতারা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকের সমিতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১)। এই সমিতি মুম্বাই ও চেন্নায়ের নেতাদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সভা গঠনের চেষ্টা করে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে মুম্বাইয়ে মুম্বাই অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২), পুণায় ডেকান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২), ও মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুণা সার্বজনিক সভা (১৮৬৭), মাদ্রাজ মহাজন সভা (১৮৮৪), লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৬৬) ও সর্বোপরি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সভা (১৮৭৬)।

ভারতে জাতীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে প্রাক্-কংগ্রেস সময়কালে পুণা সার্বজনিক সভা ও কলকাতার ভারত সভার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। পুণা সার্বজনিক সভার কর্ম পরিচালনা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হত। এই সভার সদস্যদের মধ্যে সর্দার, জমিদার, উকিল, সাংবাদিক, শিক্ষক সকলে থাকলেও এদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। পুণা সার্বজনিক সভার ঐতিহাসিক

Scanned with CamScanner

গুরুত্ব হল যে এই সমিতি মধ্যবিত্ত আন্দোলনের সীমা অতিক্রম করে আন্দোলনধর্মী কার্যকলাপে জনগণকে সংশ্লিষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময় সার্বজনিক সভার সদস্যরা ব্যাপক ত্রাণকার্যে নেমেছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষকদের দুরাবস্থা অনুসন্ধানের এক কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে হাঙ্গামার পূর্বে খাজনা বন্ধ আন্দোলনে সভা তৎপর হয়। দুঃখের বিষয়, সার্বজনিক সভায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ক্রমশ অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ঈর্ষা উদ্রেক করে এবং ১৮৮৮ সালে মহাত্মা ফুলে গণ্ড উপজাতিকে পুণা সার্বজনিক সভা বর্জন করার আহ্বান জানান। তা সত্ত্বেও পুণা সার্বজনিক সভা মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ প্রচারে ও শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৮৭৬ সালে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতা তথা বাংলার রাজনৈতিক জীবনে পটপরিবর্তনের আভাষ পাওয়া গেল। ভারত সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন পেশাদারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারত সভার সাংগঠনিক শক্তির মূলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এইসময় ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সদস্যগণ শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আঘাত হানেন এবং সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম নেতারা ভারত সভার কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ নেন। (রজতকান্ত রায় Social conflict and Political Unrest in Bengal ১৮৭৫-১৯২৭, পৃষ্ঠা ৯০-৯২ দ্রষ্টব্য)। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বাংলার বাইরে শাখা স্থাপন করে সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তারে ভারত সভা সচেষ্ট হয়। ১৮৭৬ সালে ভারত সভার শাখা ছিল মাত্র দশটি, ১৮৮৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল আশি। এদিকে ভারত সভার কর্মসূচীও ক্রমশ পরিবর্তিত হতে লাগল। ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ভারত সভার মূল রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন। ১৮৭৯-র পর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর ভারত সভা কৃষকদের স্বার্থরক্ষা প্রসঙ্গে সচেতন হয় এবং ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের স্বপক্ষে সভা সমাবেশ সংগঠিত করে। এর ফলে অভিজাত সম্প্রদায় পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ভারত সভার মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর লর্ড লিটনের শাসনকালে প্রতিষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ডঃ এস আর মেহরোত্রের মতে ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারের সময় থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় রূপ দিতে সচেষ্ট হল।[১] এই প্রচেষ্টারই পরিণতি হল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। লিটনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে যে

Scanned with CamScanner

বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পরবর্তী বড়লাট লর্ড রিপনের রাজত্বকালে 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করল। লর্ড রিপন উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নানাবিধ জনহিতকর সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীর প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। তিনি লিটন প্রবর্তিত দেশীয় সংবাদপত্র আইন তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে যে ঘটনা ভারতবাসীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন। এই বিলের মাধ্যমে বিচার বিভাগে প্রচলিত ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য নীতি বিলোপ করতে চাওয়া হয়। পূর্বে কোনও দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার করতে পারত না। এই নিন্দনীয় বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীনে এলে আইন সদস্য মিঃ সি. ইলবার্ট এই মর্মে একটি বিল আনলেন যে, বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না এবং ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইলবার্ট-এর এই বিল প্রকাশিত হলে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল এবং দেশীয় জজ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে শ্বেতাঙ্গদের বিচার হওয়া চলবে না এই মর্মে মতামত ঘোষণা করল। তারা শুধু বিক্ষোভ জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হলেন। দুঃখের বিষয়, রিপন ব্যবস্থাপক সভায় কোনও শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের সমর্থন পেলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে রিপন ইউরোপীয়দের দাবি মেনে নিলেন এবং তাঁদের সুপারিশ মত বিলটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হল (জানুয়ারী ১৮৮৩)। এইভাবে ভারতের ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের সম্মুখে ব্রিটেনের উদারনৈতিক সরকারও বিশেষত বড়লাট রিপন ব্যক্তিগত পরাজয় বরণ করলেন।[২] যাহা হউক, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রও ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত ঘটনার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই ঘটনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠল। ভারতবাসী দেখল যে তারা সংখ্যায় বিপুল হয়েও মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ শাসকদের তুলনায় কি রকম অসহায় ও দুর্বল ইলবার্ট বিল সংশোধিত হওয়ায় ভারতবাসীর মনে যে হতাশা সৃষ্টি হয় সে প্রসঙ্গে হিউম মন্তব্য করেছেন যে, ভারতবাসী বুঝতে পারলেন রিপনের মত উদারনৈতিক বড়লাটও কোনও ন্যায় বিচার করতে কতটা অক্ষম। ভারতবাসী দেখলেন যে সরকার হল এক বিশাল নির্মম যন্ত্র।[৩] শিক্ষিত ভারতীয়গণ বুঝতে পারলেন যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া আদায় করতে হলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে একটি জাতীয় সম্মেলন (National Conference) আহ্বান করলেন। ডঃ তারাচাঁদের মতে এই সম্মেলন ছিল ইলবার্ট বিল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত

Scanned with CamScanner

ভারতবাসীর সমুচিত প্রত্যুত্তর[৪] (It was the reply of educated India to the Ilbert Bill agitation)। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূতরূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং এই সম্মেলন প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে। ডঃ অনিল শীল মনে করেন জাতীয় সম্মেলনের কর্মসূচী ও কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় যে এটি ছিল জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বাভাষ (a dress rehearsal)।[৫] প্রসঙ্গত বলা যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আহূত জাতীয় সম্মেলনকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রথম পদক্ষেপ রূপে গণ্য করা যায়। বস্তুতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে সুসংহত করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন এবং ১৮৮২ সালের ২৭শে মে বেঙ্গলী সংবাদপত্রে 'জাতীয় কংগ্রেস' কথাটির উল্লেখ দেখা যায়।

একদিকে যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রীয় ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করছিলেন এবং ভারত সভাকে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন,[৬] তখন প্রায় একই সময়ে সরকারি ও অন্যান্য মহলে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা চলছিল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে উনবিংশ শতকের সত্তর দশক থেকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমকালীন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের বিশিষ্ট নেতা হেনরী কটন সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন যে সুরেন্দ্রনাথ সুদূর মূলতান থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন।[৭] এদিকে অর্থনৈতিক শোষণ ও ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে তীব্র নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর ইলবার্ট বিল আন্দোলন পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ ও জটিল করে তুলল। সঙ্ঘবদ্ধ 'শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহে'র (White Mutiny) শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে তিক্ততা বৃদ্ধি করল। ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'ভারত সভা' পাল্টা আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। শিক্ষিত সব ভারতীয় বুঝতে পারলেন যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া পূরণ হবে না। অপরদিকে কিছু কিছু উদারপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ কর্মচারী ভারতের সমস্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য ভারতবাসীর সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এইসব চিন্তা ভাবনা থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের উন্মেষ ঘটে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব সম্পর্কে নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে।

Scanned with CamScanner

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া এই মত পোষণ করেছেন যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালন অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) বড়লাট লর্ড ডাফরিনের আনুকূল্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। অপরপক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত ব্যক্ত করেছেন যে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের মুখ্য ভূমিকা ছিল কারণ প্রথমে হিউম সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলেন, কিন্তু ডাফরিন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর গুরুত্ব দেন এবং হিউম ডাফরিনের প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাফরিনের চিঠিপত্র ও বিভিন্ন মন্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে তাঁর সঙ্গে হিউমের সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না। উপরন্তু ডাফরিন হিউমের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাছাড়া প্রথম থেকেই ডাফরিন কংগ্রেসকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। বোম্বাইয়ের গভর্নরকে লেখা চিঠি (১৭ মে ১৮৮৫) থেকে জানা যায় যে হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে ডাফরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু কংগ্রেসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ডাফরিনের ঘোরতর সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। সুতরাং ডাফরিনকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা যুক্তিযুক্ত নয় এবং হিউমকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা চলে।

কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হিউমের মূল উদ্দেশ্য কি—এই ব্যাপারেও নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে। হিউম একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং সত্তরের দশকে তিনি ভারত সরকারের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, ঐ সময় গোপন সরকারি নথিপত্র অনুসন্ধান করে হিউম ভারতবাসীর অসহনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও নৈরাশ্যজনক এবং অবস্থার উন্নতি না ঘটলে যে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার ধারণ করবে। তাঁর ধারণা হল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আসন্ন বিপদের সম্মুখীন এবং এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

হিউম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য জনমত গঠনের যন্ত্র হিসাবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করলেন। ইতিমধ্যে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এরপর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি দেশের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দিলেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে

Scanned with CamScanner

ভারতীয় জাতীয় সংগঠনের পরিকল্পনা উত্থাপন করলেন। তার মতে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর নানান অভাব অভিযোগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবে এবং জনমত গঠনের কাজেও সাহায্য করবে। এরপর হিউম বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ডাফরিনের ধারণা হল যে কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবে এবং এতে ব্রিটিশ শাসন উপকৃত হবে। তারপর হিউম ইংলণ্ডে গেলেন এবং সেখানের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করলেন। অবশেষে ঠিক হল যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে পুণায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হল। ইতিমধ্যে হিউম ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় ইউনিয়নের সদস্যগণকে ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। এদিকে পুণায় কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় সম্মেলন স্থল বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত করা হল। এইভাবে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাই-এ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাহাত্তর জন প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগ দেন। সুতরাং দেখা যায় জাতীয় কংগ্রেস অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আড়ম্বরহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হিউমের উদ্দেশ্য

কিন্তু হিউম কেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন? এ ব্যাপারে প্রচলিত মত হল যে হিউম ভারতের তৎকালীন শোচনীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে রক্ষা করবার জন্য কংগ্রেস গঠন করেন কারণ এর দ্বারা ভারতবাসীর অসন্তোষ হিংসার পথে আশ্রয় না নিয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ হিউম সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হন এবং কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের এক নিরাপদ নিয়ামকের (safety valve) কাজ করবে। হিউমের জীবনীকার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন-এর রচনায় হিউমের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "সেফটি ভালব্" তত্ত্বের উপস্থাপনা দেখা যায়। ওয়েডারবার্নের বক্তব্য হল লিটনের শাসনকালে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী রূপে হিউম এমন অনেক গোপন নথিপত্র দেখতে পান যাতে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে সমস্ত ভারত জুড়ে এক গণ বিস্ফোরণ আগত প্রায়। সম্ভাব্য বিদ্রোহে যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেয় তাহলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। এইজন্য হিউম শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মৃদু ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিয়োজিত করে তাদের গণ-বিদ্রোহের স্রোত ধরে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। রজনীপাম দত্ত প্রমুখ এই মত সমর্থন করেন। তাঁর মতে কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাতিত্বে সৃষ্ট এবং একটি গোপন ষড়যন্ত্রের

Scanned with CamScanner